১২.৫ জাতীয় আন্দোলন, আজাদ হিন্দ্ বাহিনী ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু

ভারতীয় জাতীয়বাদীদের ঔপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলনের নানা ধারার মিলন ঘটেছিল বিংশ শতকের চারের দশকে। আন্দোলনের নানা দৃষ্টিভঙ্গি ও নানা কার্যসূচি থাকলেও ইংরেজ শাসনের অবসান অর্থাৎ চূড়ান্ত মুক্তির কাহিনি এ সময় প্রকট হয়ে ওঠে। ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু স্বরাজের প্রশ্ন তুলে ধরে ব্রিটিশ সরকারের কাছে জাতীয় দাবি পেশের চরমসীমা বেঁধে দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। নেতাজি জাতীয় সংগ্রামের নানা বিরোধকে সরিয়ে রেখে, অনুকূল পরিবেশকে কাজে লাগাতে চান। সভাপতির এই প্রস্তাব গান্ধিপন্থীদের বিরোধিতার ফলে বাতিল হয়ে যায়। কিছুদিন পরই 'ফরওয়ার্ড ব্লক' দল গঠন এবং তাঁর কর্মসূচি ঘোষণা আমাদের সকলের কাছে জানা ইতিহাস। সংগ্রামের জন্য যে দেশ প্রস্তুত সে কথা নেতাজি বারবার ঘোষণা করেন এবং নতুন দল গঠন করার পিছনে তাঁর বক্তব্য ছিল যে, কংগ্রেস অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগঠনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে বাস্তবোচিত রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তিনি ঘোষণা করেন 'সংগ্রামের জন্য দেশ প্রস্তুত, কিন্তু নেতাদের সংগ্রামে স্পৃহা নেই।'[৮২] বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে নেতাজি উপলব্ধি করেন, এই যুদ্ধ ভারতবর্ষের সামনে সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। নেতাজির বিশ্বাস জন্মেছিল ইউরোপে ব্রিটিশ শক্তির উপর যে ধরনের আঘাত এসেছে তার পরিণতিতে ভারতের উপর সাম্রাজ্যবাদী মুষ্টি অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়বে। গান্ধিজি এবং তাঁর অনুগামীরা স্বরাজ অর্জনের প্রশ্নে সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে একমত হতে পারেনি। জওহরলাল নেহরু স্পষ্টভাবেই জানান ঃ 'ব্রিটেন যখন জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত, সে সময় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা হবে ভারতের পক্ষে অসম্মানজনক কাজ'।[৮৩] এই সংকটময় মুহূর্তে গান্ধিজি যেমন হিংসার পথে যেতে রাজি ছিলেন না এবং বিষয়টিকে মানবিক দৃষ্টিতে দেখছিলেন অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র বসু রাজনৈতিক সুযোগ গ্রহণের জন্য সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন। অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠি সুভাষচন্দ্র বসুর এই রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রস্তাবকে যুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপটে সঠিক ছিল বলেই মন্তব্য করেছেন।[৮৪] ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে আন্দোলনের প্রশ্নে গান্ধিজি ও জিন্নাহের সঙ্গে তাঁর আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত

হয়। অন্যদিকে বিশ্বযুদ্ধের আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি দ্রুতগতিতে পালটে যেতে থাকে। জাপান ও জার্মানির আক্রমণে ব্রিটেন এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে নেতাজির বিশ্বাস জন্মে, যুদ্ধে ব্রিটিশদের পরাজয় সুনিশ্চিত, যুদ্ধকালীন শোচনীয় অবস্থার মধ্যে থেকেও ইংরেজরা কখনোই স্বেচ্ছায় ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দেবে না। তাই ভারতবাসীকে মুক্তির জন্য সংগ্রামে নামতে হবে। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে অক্ষশক্তির সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। নেতাজির এই সক্রিয় যুদ্ধ বিরোধী মনোভাবে উৎকণ্ঠিত ব্রিটিশ সরকার ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে তাকে বন্দি করে। জেলখানায় বসে নেতাজি উপলব্ধি করেছিলেন যে, স্বাধীনতার পক্ষে শক্তিগুলিকে একত্রিত করতে হলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সক্রিয় প্রবেশের প্রয়োজন। জেলে বন্দি থেকে সেটি সম্ভব নয় তা উপলব্ধি করে মুক্তি লাভের আশায় আমৃত্যু অনশন শুরু করেন। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন গভর্নরকে লেখা তাঁর একটি চিঠির অংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ বর্তমান পরিস্থিতিতে জীবনধারণ আমার পক্ষে অসহনীয়। অস্তিত্বের স্থায়িত্ব ক্রয় করার জন্য অন্যায়ের সঙ্গে সমঝোতা করে চলাটা আমার প্রকৃতি বিরোধী। এই মূল্য দেবার বদলে আমি বরং আমার জীবনটাকে উৎসর্গ করব.....একটি উদ্দেশ্যের জন্য একজন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করতে পারেন কিন্তু সেই উদ্দেশ্যে তাঁর মৃত্যুর পরেও হাজার জীবনের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখবে নিজেকে।'[৮৫] কারাগারে সুভাষের অনশন ধর্মঘট ব্রিটিশদের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ৫ ডিসেম্বর মুক্তি দেওয়া হলেও বাড়িতে অন্তরীণ করে রাখা হল তাঁকে। মুক্তিলাভের পর গৃহবন্দি নেতাজি আন্তর্জাতিক যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বিদেশি শক্তির সহায়তায় এবং বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের প্রত্যক্ষ সমর্থনে দ্বিতীয় রণক্ষেত্র উন্মুক্ত করার কথা ভাবতে থাকেন। নিজের প্রত্যয়ে অটল থেকে, দৃঢ় আশা ও আত্মবিশ্বাসকে পুঁজি করে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে ১৭ জানুয়ারি গোয়েন্দা পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মৌলবির ছদ্মবেশে কলকাতার বাসগৃহ ত্যাগ করলেন। কখনও বিমা কোম্পানির এজেন্ট, কখনও বাক্‌শক্তিহীন তীর্থযাত্রী এবং সবশেষে জিয়াউদ্দিন ছদ্মনামে কাবুল অতিক্রম করেন। আফগানিস্তান থেকে রাশিয়া হয়ে জার্মানি আসার পথে অরল্যান্ড মাজ্জোটা ছদ্মনামে ইতালির দূতাবাসের সহযোগিতায় বার্লিনে পৌঁছান। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে নেতাজি যখন বার্লিনে পৌঁছোলেন তখন জার্মানি ব্রিটেনের উপর চরম আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তিনি জার্মানিতে পৌঁছে হিটলারের কাছ থেকে এমন সক্রিয় সাহায্য কামনা করেন যার দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করা সম্ভব হবে এবং একই সঙ্গে ভারতের মুক্তির পথ প্রশস্ত হবে। ভারতবর্ষ ছেড়ে কেন তিনি বিদেশিদের সাহায্য নিতে এগিয়ে এলেন সেটি ধরা পড়েছে তাঁর সিঙ্গাপুরের এক

জনসভার ভাষণে (৯ জুলাই, ১৯৪৩) ঃ 'ভারতবর্ষে যে সংগ্রাম চলছে (মুক্তি সংগ্রাম) বাইরে থেকে তার শক্তি বৃদ্ধি করাই আমার দেশত্যাগের প্রধান কারণ। বাইরের অতিরিক্ত সাহায্য ছাড়া ভারতবর্ষের মুক্তি সম্ভব নয়। আমরা দীর্ঘদিন ধরে ইউরোপে একটি দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার কথা বলে আসছি। পূর্ব এশিয়ায় আপনারা আমাকে সম্পদ সংগ্রহ করে দিন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য একটি প্রকৃত দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'[৮৬] বার্লিনে গিরিজা মুখার্জি, এম. আর. ব্যাস ও এ. সি. এন. নাম্বিয়ার সহ কুড়িজন ভারতীয়কে নিয়ে সুভাষচন্দ্র বসু গড়ে তোলেন 'Free India Centre'। এম. আর. ব্যাসকে আজাদ হিন্দ্ রেডিওর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যে ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় ভারতীয় যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে গড়ে তোলেন 'Indian Legion'[৮৭] (Free India Army)। রাশিয়া হয়ে জার্মানিতে পৌঁছোনোর পর জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর (রিবেনট্রপ) সঙ্গে নেতাজি দেখা করে ইউরোপে ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত পরিকল্পনা পেশ করেন। এই পরিকল্পনায় বলা হয় ঃ (ক) তিনি বার্লিন থেকে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রচার কার্য পরিচালনা করবেন। (খ) জার্মানিতে বন্দি ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে স্বাধীন ভারতীয় সংঘ প্রতিষ্ঠান করবেন। (গ) জার্মানি ভারতের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দান করবে। (ঘ) আফগানিস্তানকে ভারত ও ইউরোপের মধ্যে যোগসূত্রের ঘাঁটি রূপে ব্যবহার করতে হবে। অন্যান্য দাবিগুলি জার্মান সরকার মেনে নিলেও ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কিত বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি ছিল না। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে জার্মান সৈন্যরা রাশিয়া আক্রমণ করলে নেতাজি মর্মাহত হন ও একই সঙ্গে ভারতবাসীর মনেও তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। নেতাজি ইউরোপ থেকে সংগ্রাম চালানোর রণকৌশলের পরিবর্তন ঘটান। ইতিমধ্যে এশিয়া সম্পর্কে জাপানের রণনীতিরও পরিবর্তন ঘটছিল। পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে স্বাধীনতা লাভের সংগ্রামকে জাপানিরা নিজের স্বার্থে সাহায্যের প্রস্তাব দেয়। ভারতবর্ষের জন্য জাপান একটি নীতিও প্রস্তুত করে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের অভাবনীয় সামরিক সাফল্য নেতাজিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। সুতরাং নেতাজির দৃষ্টি জার্মান থেকে সরে এসে জাপানের উপর নিক্ষিপ্ত হয়।

পূর্ব এশিয়াকে কর্মক্ষেত্র রূপে গ্রহণ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য যে ব্যক্তিটি নিরলস সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর নাম রাসবিহারী বসু। জাপানে রাসবিহারী বসু, থাইল্যান্ডে বাবা অমর সিং এবং সাংহাইয়ে বাবা ওসমান খান সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বৈপ্লবিক কর্মে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এইসব বিপ্লবীদের মধ্যে বাবা অমর সিংয়ের নেতৃত্বে ব্যাংককে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ভারতীয় স্বাধীনতা লিগ' (১৯৪১)।[৮৮] ডিসেম্বর মাসে জ্ঞান প্রীতম সিং ও ক্যাপ্টেন মোহন সিংয়ের মধ্যে ভারতীয় স্বাধীনতা লিগ গঠন নিয়ে আলোচনা আরও এগিয়ে গেল। মোহন সিং

চুয়ান্ন জন সৈন্যকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাংককে গঠন করেন 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জাপানের অগ্রগতি অব্যাহত রইল। সিঙ্গাপুরের পতন ও ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে মুক্তির জন্য জাপানের ঘোষণা পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। টোকিওতে অতঃপর ভারতীয় বিপ্লবীরা মিলিত হয়ে রাসবিহারী বসুর উদ্যোগে গঠন করেন 'Indian Independence League'। এই লিগের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যের কথা ঘোষিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য যে বাহিনী গঠিত হয় তার নাম স্থির হয় আজাদ হিন্দ্ বাহিনী (Indian National Army, 15th June, 1942)। ব্যাংকক সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সরকারিভাবে সমর্থন করেন। সম্মেলনে রাসবিহারী বসু, জেনারেল মোহন সিং, পি. কে. মেনন এবং জি. কিউ. গিয়ানিকে নিয়ে গঠিত হয় একটি কর্মপরিষদ। এই পরিষদের হাতে স্বাধীনতা লিগ ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্পিত হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বসু যাতে পূর্ব এশিয়ায় পৌঁছোতে পারেন সে বিষয়ে জার্মান সরকারকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছিল। সকলেই তখন কামনা করছিলেন যে সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ্ ফৌজের দায়িত্বভার গ্রহণ করুন। ইতিমধ্যে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের কর্মক্ষেত্র সিঙ্গাপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাপানি সংযোগ রক্ষাকারী অফিসার নিযুক্ত হন মেজর ফুজিয়ারা। ব্যাংকক সম্মেলনের পর ভারতীয় স্বাধীনতা লিগ জাপান সরকারের কাছে ভারতের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত কোনো সরকারি নীতি আদায় করতে না পারায় আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর মধ্যে সন্দেহ দেখা দেয়। আজাদ হিন্দ্ বাহিনীকে জাপানিরা যে সব অস্ত্র সরবরাহ করছিল সেই সম্পর্কে এবং জাপানের প্রকৃত ইচ্ছা নিয়ে বিপ্লবীদের সংশয় ক্রমশ বাড়তে থাকে। বিশেষত জেনারেল মোহন সিংয়ের সঙ্গে রাসবিহারী বসু ও জাপান সরকারের মতান্তর শুরু হয়। মোহন সিং জাপানিদের হাতে গ্রেপ্তার হলে, আজাদ হিন্দ ফৌজের অস্তিত্ব প্রায় সংশয়ের সম্মুখীন হয়। এই অবস্থায় রাসবিহারী বসু লিগ ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজকে নতুনভাবে গড়তে এগিয়ে এলেন। সুভাষচন্দ্র বসুর পূর্ব এশিয়ায় না পৌঁছোনো অবধি তাঁর আপ্রাণ প্রচেষ্টায় আজাদ হিন্দ্ বাহিনী বেঁচে রইল। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে রাসবিহারী বসু পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের নিয়ে একটি সভার আহ্বান করেন।[৮৯] এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ভারতের স্বাধীনতা লিগেরই ফৌজ এবং এই ফৌজদের আনুগত্য থাকবে লিগের প্রতি। লিগের গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে রাসবিহারী বসুর হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা তুলে দেওয়ার ফলে আজাদ হিন্দ্ বাহিনী তার সংকট কাটিয়ে ওঠে এবং এই বাহিনী অপেক্ষা করতে থাকে নেতাজির নেতৃত্বের প্রতি। অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র বসু জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপকে এক চিঠিতে (৪ ডিসেম্বর, ১৯৪২)

প্রাচ্যে যাওয়ার জন্য জার্মান সরকারের সাহায্যের অনুরোধ জানান। জার্মান থেকে জাপানে আসা যে অত্যন্ত ঝুঁকিবহুল যাত্রা হবে তা জার্মান সরকার জানিয়ে দেয়। নেতাজি ঝুঁকি নিয়েই সাবমেরিনে চড়ে নব্বইদিন সমুদ্র অভিযানের মধ্য দিয়ে টোকিওতে পৌঁছোন। জাপানি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য সর্বপ্রকার প্রতিশ্রুতি লাভ করে রাসবিহারী বসুকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে যান সিঙ্গাপুরে। বেতার মারফত বিশ্ববাসী যখন পূর্ব-এশিয়ায় সুভাষচন্দ্র বসুর উপস্থিতির কথা জানতে পারে তখন সবচেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে ভারতীয়রা। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই নেতাজি বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় স্বাধীনতা লিগ ও আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন।[৯০] সশস্ত্র অভিযান পরিচালনার জন্য সামরিক বাহিনীকে পুনর্গঠন এবং একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার উপর নেতাজি গুরুত্ব আরোপ করেন। একদিকে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়ক রূপে দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি দ্রুতগতিতে তার সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে তোলেন এবং গঠনতন্ত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনেন। আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর মধ্যে গড়ে তোলেন মহিলা বিভাগ 'ঝাঁসি রেজিমেন্ট' যার দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছিল লক্ষ্মী স্বামীনাথনের উপর। মাত্র চার মাসের মধ্যে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীকে একটি শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত করে নেতাজি সংগ্রামে এক দুরূহ কাজকে সম্পাদন করেন। অস্থায়ী সরকার গঠনের প্রক্রিয়াও ইতিমধ্যে এগিয়ে চলেছিল। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ২১ অক্টোবর ভারতের স্বাধীনতা লিগের প্রতিনিধিরা সমবেত হয়ে অস্থায়ী সরকার গঠনের প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। এই অস্থায়ী সরকারের লক্ষ্য হয় ব্রিটিশ ও তার মিত্রদের ভারতের মাটি থেকে বিতাড়িত করার জন্য লড়াই শুরু করা এবং সেই লড়াইকে নেতৃত্বদান। এই অস্থায়ী সরকার ভারতের মাটিতে স্থানান্তর হবার পর স্থায়ী জাতীয় সরকারের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। এই সরকারের মূল ধ্বনি হল ঃ জয় হিন্দ্ ও দিল্লি চলো।[৯১] অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী, সমর ও পররাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বভার অর্পিত হয় সুভাষচন্দ্র বসুর উপর। এস. এ. আয়ার অস্থায়ী সরকারের প্রকাশনা ও প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, এ. সি চ্যাটার্জিকে দেওয়া হয় অর্থদপ্তরের দায়িত্ব এবং শ্রীমতি লক্ষ্মী স্বামীনাথন মহিলা বিভাগের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অস্থায়ী সরকারের সর্বোচ্চ উপদেষ্টা নির্বাচিত হন রাসবিহারী বসু। জাপান, জার্মানি, ইতালি সহ ছয়টি রাষ্ট্র আজাদ হিন্দ্ সরকারকে স্বীকৃতি দান করে এবং নতুন সরকার ২৪ অক্টোবর ইংল্যান্ড ও তার মিত্র রাষ্ট্র আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইতিমধ্যে পূর্ব এশিয়ায় জাপান আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করেছিল। জাপানের প্রধানমন্ত্রী অস্থায়ী সরকারের হাতে এই এলাকা দুটি তুলে দিলে অস্থায়ী সরকার দ্বীপপুঞ্জের নতুন নামকরণ করে 'শহীদ' ও 'স্বরাজ' দ্বীপপুঞ্জ। অস্থায়ী সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে দ্বীপপুঞ্জের দায়িত্ব অর্পিত

হয় কে. ডি. লোকনাথনের উপর। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ৩১ ডিসেম্বর স্বাধীন ভারতের এই দ্বীপপুঞ্জে নেতাজি এসে পৌঁছোন। যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি অনুসারে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রধান কর্মকেন্দ্রকে ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে নিয়ে আসা হয়। আজাদ হিন্দ্ বাহিনীও নেতাজির নেতৃত্বে ব্রিটিশদের উপর চরম আঘাত হানার জন্য ব্রহ্মদেশকে অভিযানের শক্তিশালী ঘাঁটিতে পরিণত করেন। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ১৮ মার্চ আজাদ হিন্দ্ বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে ভারত ভূমিতে উপনীত হয়। রেঙ্গুনে ভারতীয় স্বাধীনতা লিগ চব্বিশটি বিভাগে বিভক্ত হয়ে কাজকর্ম পরিচালনা শুরু করে। ইতিমধ্যে অধিকাংশ আজাদ হিন্দ্ ফৌজ মালয় থেকে থাইল্যান্ড হয়ে ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হয়। বাহিনীর একাংশ কর্ণেল এস. এ. মালিকের নেতৃত্বে মণিপুরের মৈরাং-এ ভারতের জাতীয় ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করে।

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে জাপানিদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণকৌশল হয়ে দাঁড়ায় চিনদুইন পর্বতমালা থেকে পশ্চিমের দিকে অভিযান, ইম্ফলে কেন্দ্রীভূত ব্রিটিশ-ভারতীয় চতুর্থ কোরের যোগাযোগ বিনাশ ও আরাকানের সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করা (পরিকল্পনার সাংকেতিক নাম ছিল HA-GO)। কালদান উপত্যকা থেকে ব্রিটিশ বাহিনী বিতাড়িত হয়, অন্যদিকে জাপানিরা ইম্ফল অভিযানে অগ্রসর হয়। সিঙ্গাপুর বিজয়ী সেনাপতি মুতাগুচি ইম্ফল-কোহিমা রণাঙ্গণে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করেছিল ইম্ফলের ব্রিটিশ ঘাঁটি এবং সেই সুযোগে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ বাহিনীকে ভারতের মাটিতে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য সাহায্য করা। ইতিমধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। একের পর এক জাপানি বাহিনীর পরাজয় ঘটতে থাকে। পরাজয়ের গ্লানি দূর করতে প্রধানমন্ত্রী তোজো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গণে যুদ্ধের ঝুঁকিকে সমর্থন করেন। আজাদ হিন্দ্ বাহিনী জাপানিদের নেতৃত্বে যুদ্ধ শুরু করলেও ভারতীয় মুক্তাঞ্চলগুলি অস্থায়ী সরকারের উপর অর্পণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাপানি পঞ্চদশ আর্মি চিনদুইন অতিক্রম করে ইম্ফলের দিকে অগ্রসর হলে বিশাল বাহিনী নিয়ে ইংরেজরা বাধাদান করে। ইম্ফলে জাপানি পঞ্চদশ বাহিনী বিপুল বিক্রমে লড়াই করলেও ব্রিটিশদের উচ্চ মনোবল, উন্নত যুদ্ধ কৌশল ও বিমান আক্রমণের কাছে জাপানিদের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর বিভিন্ন ব্রিগেড (গান্ধি ব্রিগেড, সুভাষ ব্রিগেড, আজাদ ব্রিগেড) জাপানিদের সাহায্য করলেও সমরাস্ত্র সরবরাহ পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জাপানি বাহিনীর কাছে পরাজয় নেমে আসে। প্রবল বৃষ্টি, রোগের প্রাদুর্ভাব এবং সেনাপতির অকর্মণ্যতার ফলে রণক্ষেত্রে হতাশার সৃষ্টি হয়। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ২৬ জুলাই জাপান সরকার ইম্ফল অভিযান বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করে এবং প্রধানমন্ত্রী তোজো পদত্যাগ করেন। এই ঘটনাগুলির মধ্যে নেতাজি পরাজয়ের সংকেত পেলেন। প্রবল বর্ষণকে পরাজয়ের

কারণ হিসাবে দায়ী করা হলেও নেতাজি জানতে পেরেছিলেন যে তার এক-চতুর্থাংশ সৈন্য ইম্ফল থেকে পালাতে শুরু করেছে নতুবা ধরা পড়েছে। ব্রিটিশদের ব্রহ্মদেশ অভিযান শুরু হলে I.N.A. বাহিনী পি. কে. সায়গলের নেতৃত্বে জাপানের পাশে দাঁড়ালেও সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। শেষপর্যন্ত অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রীরা নেতাজিকে রেঙ্গুন ছাড়ার পরামর্শ দেন। নেতাজি অনিচ্ছা সত্ত্বেও রেঙ্গুন ছেড়ে যেতে বাধ্য হন, কারণ ইতিমধ্যে ব্রিটিশ বাহিনীর অগ্রগামী সেনাদল রেঙ্গুন সীমান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। জাপান বাহিনীও রেঙ্গুন ছেড়ে চলে যাবার আগে দলিলপত্র নষ্ট করার কাজে লিপ্ত ছিল। ২৪ এপ্রিল ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে রাত্রে নেতাজি একদল সঙ্গী ও ঝাঁসি বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে ব্যাংককের পথে রওনা হন। ১৪ মে তিনি ব্যাংককে গিয়ে পৌঁছোন। ইতিমধ্যে যুদ্ধে জার্মানির পরাজয় ঘটে, জাপান ইংল্যান্ড ও আমেরিকার যৌথ বাহিনীর কাছে টিঁকে থাকার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। ভবিষ্যতে জাপানি সাহায্যের আশা নেই উপলব্ধি করে নেতাজি রাশিয়ায় পৌঁছোনোর চেষ্টা করতে থাকেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে নেতাজি আরও হতাশ হয়ে পড়েন। রুশরা প্রচণ্ড বেগে জাপান অধিকৃত মাঞ্চুরিয়ার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, তার দুদিন পরে জাপান মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই সংবাদ নেতাজি আজাদ হিন্দ্ বাহিনী নিয়ে লড়াইয়ের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তাকে ধূলিসাৎ করে দেয়। জাপানের আত্মসমর্পণের সংবাদ সরকারিভাবে ঘোষিত হলে (১৫ আগস্ট, ১৯৪৫) নেতাজি সিদ্ধান নেন যে রুশ অধিকৃত মাঞ্চুরিয়া যাওয়ার জন্য ব্যাংককে পৌঁছোবেন। সিঙ্গাপুর ত্যাগের আগে পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে এক বিশেষ ভাষণে নেতাজি বলেন ঃ (১৫ আগস্ট, ১৯৪৫), 'আমাদের সাময়িক পরাজয় যেন আপনাদের আশাভঙ্গ না হয়। মুখে হাসি ফোটান এবং উৎসাহ বজায় রাখুন। সব থেকে বড়ো কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থা হারাবেন না। পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যে ভারতবর্ষকে শৃঙ্খল পরিয়ে রাখতে পারে। ভারত স্বাধীন হবে, সেদিন দূরে নয়'।[৯২] ব্যাংকক থেকে সায়গন বিমান বন্দর পর্যন্ত নেতাজির সঙ্গী যাঁরা ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম এস. এ. আয়ার। তিনি লিখেছেন সায়গনে পৌঁছোবার পর নেতাজির জীবনে কঠিন মুহূর্তটি শুরু হয়। তাঁর সম্পর্কে আজ পর্যন্ত জানা সর্বশেষ বিমান যাত্রা হয়েছিল এক জাপানি বোমারু বিমানে। ইঙ্গ-আমেরিকান বাহিনীর বন্দিদশা এড়াতে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে সায়গন থেকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছোবার জন্য জাপানি বোমারু বিমানে তাঁর সঙ্গী হলেন হবিবুর রহমান। সায়গন থেকে যাত্রার পর ফরমোজা দ্বীপে (১৮ আগস্ট, ১৯৪৫) এক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজি মারা যাওয়ার খবর প্রচারিত হয়। নেতাজির মৃতদেহ সিঙ্গাপুর বা টোকিওতে কেন আনা হল না এই প্রশ্নের উত্তর আজও

পাওয়া যায়নি। পূর্ব এশিয়া বা ভারতের বৃহৎ অংশের মানুষ জাপানিদের প্রচারিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু কাহিনি বিশ্বাস করতে চাইল না, আজও তাঁর মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত। যাইহোক, রণক্ষেত্রে স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতাজির নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ বিজয়ী হতে পারেনি, কিন্তু আজাদ হিন্দ্ সেনাদের ভারত আগমনের ফলে ব্রিটিশ শক্তি এই নেতার বজ্র নির্ঘোষে খণ্ড খণ্ড হয়ে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ল।[৯৩] নেতাজির নেতৃত্বে I.N.A. বাহিনীর লড়াই নিশ্চিতভাবে ভারতের ব্রিটিশ শাসনের অবসানকে ত্বরান্বিত করে তুলেছিল।